ডঃ বিধানচন্দ্র রায়

জন্ম ১লা জুলাই ১৮৮২
মৃত্যু ১লা জুলাই ১৯৬২

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি পার হয়ে ছেষট্টি চলছে। বয়সের অঙ্কই বলে তাঁর কর্মময় জীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছিল পরাধীন ভারতে। তখন তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেটাই কাজে লাগিয়ে ছিলেন স্বাধীন দেশের গঠনকর্মে। তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই উঠে এসেছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের নানা পর্যায় থেকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রফুল্ল ঘোষ বা প্রফুল্ল সেনই হোন, বা সর্বভারতীয় স্তরের জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই হোন, এদেঁর পিছনে অন্য সব কাজ ত্যাগ করে রাজনীতিকেই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করে তোলার ইতিহাস ছিল। কিন্তু বিধান রায়ের ইতিহাস তা ছিল না। তিনি মানুষ হয়েছিলেন সেকালের আর পাঁচটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের মত গার্হস্থ্য আশা আকাঙ্খার গণ্ডীতে। ভবিষ্যতে বড় চিকিৎসক হয়ে চিকিৎসা ও গবেষণা করে দিন কাটাবেন এইরকমই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। নেতা হবার বাসনা তাঁর ছিল না। কিন্তু পরে রাজনীতি ও নেতৃত্ব যেন অনিবার্যভাবে একটু একটু করে তাঁকে ক্ষমতার কেন্দ্রে টেনে এনেছিল। তিনি আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রস্তুতি পর্ব

বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল পাটনার বাঁকিপুরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই। তাঁর বাবার নাম প্রকাশচন্দ্র রায় মা অঘোরকামিনী দেবী। তাঁরা পাঁচ ভাইবোন ছিলেন বিধানই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগনার শ্রীপুর গ্রামে। কিন্তু চাকরিসূত্রে দু পুরুষ ধরেই তাঁরা বাংলা ও ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বড় বংশের ছেলে হলেও পৈতৃক বিত্তসম্পত্তি প্রকাশচন্দ্রের বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু উৎকৃষ্ট শিক্ষা ছিল, এবং মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ আদর্শনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা। তাঁর পত্নীও বুদ্ধি বিবেচনা ও সহনশীলতার গুনে গুনবতী ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র নিজে যথেষ্ট সুশিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু খুব বড় কোনো চাকরি তিনি করতেন না। সেকালের চাকরির স্বল্প আয়ে পাঁচ সন্তানসহ পরিবার প্রতিপালন হতো কায়ক্লেশে। সেইজন্য বিধানচন্দ্রের শৈশব প্রাচুর্যের মধ্যে কাটেনি, কেটেছিল অভাবের সংসারে। এরই মধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রকাশচন্দ্র চাকরিস্থলে কিছু উন্নতি করেন। এ বাবদে উপার্জন যেটুকু বেড়েছিল তা তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার না করে করেছিলেন ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষায়। তিনটি ছেলেকেই তিনি যথাসম্ভব সুশিক্ষিত করেছিলেন, এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতেও পাঠিয়েছিলেন।

বিধানচন্দ্রের ছাত্রজীবন শুরু হয় পাটনাতেই। ওখানকার স্কুল ও কলেজ থেকেই তিনি বি এ পর্যন্ত পাশ করেছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ও মনোযোগী হলেও প্রথম দিকে অসাধারণ কিছু ছিলেন না। ১৯০১ সালে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করবার পর তিনি যখন কলকাতায় পড়তে এলেন তখনও পর্যন্ত চিত্রটা ছিল এইরকমেরই।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি নিয়ে ভর্তি হবার পরই তাঁর ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভা যেন হঠাৎ জেগে উঠল। শিক্ষকেরা বুঝলেন এ এক অসাধারণ ছাত্র। এই ঘটনায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র রকমের। কেউ কেউ যেমন তাঁকে গভীর স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন, তেমনই আবার কেউ কেউ হলেন ঈর্ষাপরায়ণ। অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস বিধানচন্দ্রকে পুত্রবৎ কাছে টেনে নিলেন। এই নবীন ছাত্রটির প্রতি তাঁর এতদূর আস্থা জন্মাল যে একে তিনি বহুবার অন্যের রোষ থেকে শুধু রক্ষাই করেন নি, তার সুবিধা হবে বলে অস্ত্রোপচারের সময় সহকারী রূপে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন যাতে তার উপার্জন এবং অভিজ্ঞতা দুটিই লাভ হয়। পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র এই লিউকিস সাহেবকে তাঁর জীবনের চালকও প্রেরণাদাতা বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে তাঁর ভিতর কার সুপ্ত শক্তি ও মনুষ্যত্ববোধকে তিনিই প্রথম জাগিয়ে তুলেছিলেন। এইভাবে মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই বিধানচন্দ্র ইংরাজচরিত্রের ভালো মন্দ দুটো দিকই দেখেছেন। একদিকে যেমন ছিলেন কর্নেল লিউকিসের মত ডাক্তার অন্য দিকে ছিলেন আর বেশ কিছু ডাক্তার (তারা সকলেই শ্বেতাঙ্গ) যাঁরা জাতিবিদ্বেষবশতঃ পদে পদে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছেন। পরাধীনতার অপমানবোধ হয়ত এইভাবেই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিধানচন্দ্র যখন ডাক্তারিবিদ্যার একাগ্র ছাত্র তখন অন্য নানা দিক দিয়ে কলকাতা শহর ছিল উত্তাল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তখন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পথে বার হয়ে এসেছেন আন্দোলনের সমর্থনে। সেই আবেগমথিত দিনেও কিন্তু বিধান রায় ছিলেন নির্বিকার। আন্দোলনে যোগ দিয়ে নষ্ট করবার মত সময় ও মানসিকতা তাঁর ছিল না।

১৯০৬ সালে ডাক্তারি পাশ করে হাউসস্টাফের কাজ করতে করতেই বিধানচন্দ্র চেষ্টা করছিলেন লন্ডনের সেন্ট বার্থলো মিউজ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ ইনস্‌টিট্যুটে ভর্তি হবার। তখন ওটাই ছিল চিকিৎসাবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে একাধিকবার তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয় নি, কারণ তিনি পরাধীন দেশের কালা আদমি। শেষ পর্যন্ত তাঁর হিতৈষিদের চেষ্টায় বাধা দূর হয় এবং ১৯০৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডন রওনা হয়ে যান।

সেন্ট বার্থলোমিউজের শিক্ষকেরা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। মাত্র দু বছরের মধ্যে তিনি এফ. আর. সি. এস এবং এম. আর. সি. পি. ডাক্তারী বিদ্যার এই দুই সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন। এম. আর. সি. পি. তে হলেন প্রথম। তারপর ফিরে এলেন স্বদেশে। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি শ্বেতাঙ্গ নন এবং হেল্‌থ্‌ সার্ভিসের পরীক্ষা দেওয়া লোক নন এই কারনে মেডিকেল কলেজে তাঁর স্থান হয় নি। তনি কাজ পেলেন ক্যাম্বেল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ)। বেতন হল ৩৩০ টাকা এখানেও তাঁকে জাতিবিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছে। তাঁর বেতনকে শ্বেতহস্তী পোষার সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর শ্বেতাঙ্গ ওপরওলা। অবশেষে বেসরকারি উদ্যোগে যখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর) স্থাপিত হল বিধান রায় সেখানেই চলে এলেন। বেতন, চাকরির শর্ত, আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা এসব নিয়ে তিনি কোনও প্রশ্ন তোলেন নি, তাঁব একমাত্র লক্ষ্য ছিলো কাজের স্বাধীনতা।

ইতিমধ্যে প্রাইভেট প্রাকটিস মারফৎ কলকাতা শহরে অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। উপার্জনও বেড়েছে। অকৃতদার, সংযত স্বভাব ডঃ রায় প্রচুর দানধ্যনও করেছেন লোকচক্ষুর অগোচরে। বড় মাপের মানুষ বলে দেশবাসী তাঁকে গ্রহণ করেছে। এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিনি স্নেহধন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের তিনি সদস্য। শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর নিজের বাড়ি ও গাড়ি আছে। সব মিলিয়ে

সৃষ্টিসন্ধান

কলকাতা শহরের তিনি একজন প্রতিষ্ঠত লোক। তখনও তাঁর বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নি।

রাজনীতিতে প্রবেশ

এতদিন পর্যন্ত ডঃ রায় ছিলেন শুধুই চিকিৎসক। এইবার তাঁকে পা রাখতে হল রাজনীতির জগতে। তখন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সীমিত স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এক ধরনের বিধানসভা ছিল। সর্বভারতীয় জাতীয় দল বলতে ছিল একমাত্র কংগ্রেস (পরে মুসলিম লিগও আসে)। কিন্তু এখনকার মত তখনও (হয়ত বা আরও বেশি) কংগ্রেস ছিল নানা দল উপদল ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। কংগ্রেস ভেঙে নানা দল হত আবার পরে কংগ্রেসেই মিশত বা মিশত না। তাছাড়া কংগ্রেসের ভিতর থেকেই ইস্যুভিত্তিক বিরোধিতা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। এই প্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে চব্বিশ পরগনার বারাকপুরে প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথকে অনেকের পছন্দ ছিল না। অন্তত: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তো ছিলই না। তিনি চাইছিলেন বিধান রায়ের মত একজন তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা, কর্মদক্ষ যুবক আইনসভায় যাক। প্রধানত: তাঁরই উদ্যোগে বারাকপুর কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথের বিপরীতে নির্দল প্রার্থীরূপে বিধানচন্দ্র ভোটে দাঁড়ালেন। ভোটযুদ্ধে ইন্দ্রপতন হল। সুরেন্দ্রনাথকে হারিয়ে বিধান রায় অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় প্রবেশ করলেন।

তখনও তিনি কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন আরও পরে ১৯২৮ সালে। ক্রমে নানা ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন। কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন একাধিকবার। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়েছেন। ইলেকশন কমিটির সভাপতি হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক চিকিৎসক বাহিনী গঠন করেছেন। রেঙ্গুনের শরনার্থীদের জন্য সিভিল প্রটেকশন কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন। এছাড়াও বহু সংস্থায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। কাজ করেছেন নিপুণভাবে। যেখানে মতে মেলেনি তৎক্ষনাৎ পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু আন্দোলনে যোগ দেন নি। এমন কি ৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও নয়। আর কোনও অবস্থাতেই যে কাজটা ছাড়েন নি তা হল চিকিৎসা।

স্বাধীন দেশে মুখ্যমন্ত্রী

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল ডঃ রায় তখন ছিলেন বিদেশে। গিয়েছিলেন ১৯৪৭ এর জুনমাসে, ফিরলেন নভেম্বরে। ততদিনে দেশের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। বিশেষ করে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যারপর নাই বিপন্ন। এখানে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গান্ধীবাদী, অনাড়ম্বর এই নেতা ছিলেন সৎ ও সরলপ্রাণ এক আদর্শবাদী ব্যক্তি। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে সবচেয়ে সমস্যা জর্জরিত প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরবার মত শক্ত লোক ছিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করলেন। বস্তুত তাঁকে বাধ্য করা হল। সেই শূন্য আসনে পন্ডিত নেহরুর বিশেষ ইচ্ছায় বসলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। তখন থেকে ১৯৬২ তে মৃত্যু পযন্ত তিনিই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে তিনটি সাধারণ নির্বাচন পার হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই তিনি জিতেছেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সেই সময়ে কী হাল ছিল পশ্চিমবঙ্গের? ১৯৪৩ সালে এখানে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে গেছে। ১৯৪৬ এ ঘটে গেছে ততোধিক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জনজীবন বিপন্ন। তদুপরি পূর্ব পাকিস্থান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার শরনার্থী এসে দেশে বসে যাচ্ছে। এখুনি এদের আহার ও আশ্রয় চাই এবং অনতিবিলম্বে চাই পুনর্বাসন। কেন্দ্রীয় আমলারা পশ্চিমপাঞ্জাবের বিষয়ে যতটা তৎপর পূর্ববাংলার বিষয়ে ততটাই উদাসীন। তদুপরি দেশের বামমার্গী বিরোধীপক্ষ দেশের এই সঙ্কটে অন্যান্য সভ্য দেশের বিরোধীপক্ষের মত সাহায্যের হাত বাড়ানো দূরে থাকুক এই মত্তকায় ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। তারা অবিরল অপপ্রচার এবং সাধ্যমত অন্তর্ঘাতে নিরত। ছেষট্টি বছরের বিধানচন্দ্র এই বিপর্যয়কে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলেন এবং নবযুবকের মত উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরেছিলেন। জাতির সৌভাগ্য যে তিনি তা করেছিলেন। তাঁরই প্রয়াসে পরবর্তী দশ বারো বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তার সংকট কাটিয়ে ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর প্রদেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠতে পেরেছিল।

বিধান রায়ের তৎকালীন কর্মকাণ্ডের পুরো বিবরণ আজ জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত। এখানে তার পুরো পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ততম চুম্বকটুকু দেওয়া হল। কিছু বাদ পড়েও যেতে পারে।

১। প্রশাসনকে সক্রিয় ও সচল রাখা, এবং সৎ ও কর্মক্ষম যোগ্য লোককে উচ্চপদে বহাল করা।

২। স্বাস্থ্যবিভাগকে ঢেলে সাজানো, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও সেগুলিকে চালু রাখা ও সরকারি হাসপাতালগুলির উন্নতি।

৩। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত সেচব্যবস্থা — দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠন।

৪। অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন — সাঁওতালডি, ব্যাণ্ডলও কোলাঘাটে কেন্দ্র স্থাপন

৫। দুর্গাপুর শিল্পনগরী

৬। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ

৭। সল্টলেক উপনগরী

৮। হলদিয়া বন্দর

৯। ফরাক্কা ব্যারেজ

১০। হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প

১১। স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন

১২। খড়গপুর আই. আই. টি.

১৩। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন

১৪। বর্ধমান প্রভৃতি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

১৫। নূতন স্কুল ও কলেজ

১৬। রনজি স্টেডিয়াম (আংশিক)

১৭। সত্যজিৎ রায়ের উত্থানে সাহায্য

১৮। শরনাথীদের জন্য আন্দামান ও দণ্ডকারন্যে নতুন বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা, যদিও এই কাজটিতে তিনি পুরো পুরি সফল হন নি।

দেখা যাচ্ছে এই সব কাজকর্মের কোনটিই স্বল্পস্থায়ী গিমিক নয়। প্রত্যেকটিই দীর্ঘমেয়াদি। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ভেবে চিন্তে করা। প্রত্যেকটি কাজই তিনি নানা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে গিয়েও লেগে পড়ে থেকে সম্পন্ন করেছিলেন। এবং তার ফলে বাঙ্গালী অচিরকালের মধ্যে সংকট থেকে উদ্ধার পেয়ে সুদিনের মুখ দেখেছিল।

এই সব কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন তাঁর স্বভাবের কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

১। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিকল্পনা করে নিয়ে সময়সীমা বেঁধে কাজে নামতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর দখল ছিল বলে যুক্তির দ্বারা ওপরওলার সম্মতি আদায় করতেন এবং অধস্তনকে বাধ্য করতেন কাজ করতে।

২। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল। কংগ্রেসের বিবদমান গোষ্ঠী ও উপদলগুলিকে কিছুমাত্র পাত্তা না দিয়ে তিনি তাঁর পদকে এ সবের উর্ধে রাখতেন এবং সেইভাবেই পণ্ডিত নেহরু সহ সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারতেন।

৩। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের গুনে তিনি নিজ ক্ষমতার সীমানার বাইরে যেতেন না, এবং কাউকে তাঁর অধিকারের সীমানায় ঢুকতে দিতেন না, সে যেই হোক।

৪। যোগ্য লোকের হাতে কঠিন কর্মের ভার দিতেন। দরকার হলে যোগ্য লোক খুঁজে আনতেন । যোগ্যতা বিচারে কখনও দলবাজি করতেন না, কারও সুপারিশও মানতেন না। যোগ্য লোককে তিনি কাজের স্বাধীনতা দিতেন, স্বীকৃতি দিতেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষ তাদের পরামর্শ নিতেন।

৫। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের কাজগুলি মনপ্রান ঢেলে করতেন, কিন্তু দলের কাজ করে সময় নষ্ট করতেন না। দলের দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণ অর্পণ করেছিলেন অতুল্য ঘোষকে। সেখানে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রশাসন এবং দলকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছিলেন।

৬। শুধু প্রশাসন নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি দলমত নির্বিশেষে গুণীর কদর করেছেন। শুধু সত্যজিৎ রায়কে সাহায্য করা নয়, যাঁরা তাঁর শত্রুপক্ষ তাঁদেরও তিনি সাহায্য করেছেন। কমিউনিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রোগে ও দারিদ্র্যে বিপন্ন তিনি তাঁকে অনুদান দিয়েছেন। কমিউনিস্ট সমরেশ বসু যখন জেলে বন্দি, তাঁর বিপন্ন স্ত্রী পুত্রকে মাসোহারা দিয়েছেন। বিরোধী নেতা হিসাবে জ্যোতি বসু তাঁকে গালাগালি দিলেও তিনি প্রশ্রয়ের সঙ্গে তা শুনেছেন এবং তাঁর উত্থানে পরোক্ষে সাহায্যই করেছেন। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন দেশের মুখ্যমন্ত্রী, শুধু দলের নয়।

তবু তিনি কেন উপেক্ষিত

বিধান রায় দেশের জন্য যা করেছিলেন সে তুলনায় তাঁর খ্যাতি নেই। তাঁকে নিয়ে সরকারি বা বেসরকারি কোনো স্তরেই তেমন চর্চা নেই, যা থাকা উচিত ছিল। এরকম হবার কারণ কি? এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ শ্রী অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যেতে পারে—

''বিধানচন্দ্রের এই কর্মযোগের মূল্য ও মহিমা বোঝার ক্ষমতা তাঁর সমকালীন বাঙালী সমাজের ছিল না। আবার যেহেতু কাজপাগল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নানা কাজ ও পরিকল্পনায় মগ্ন থাকতেন, হরদম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন না, প্রায় প্রতিদিনই সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়ে ফিতে কাটতেন না, বা উদ্বোধনী ভাষন দিতেন না, সে কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়। এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেও তাঁকে কর্তৃত্বপরায়ণ এক এলিট রূপে গন্য করতেন। এই ভ্রান্ত ধারনা গড়ে ওঠার পিছনে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষেরও এক বড় ভূমিকা ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বিরোধী দলের কোনও নেতা তাঁকে অসামান্য কল্পনাশক্তিও কর্মশক্তি সম্পন্ন এক অনন্য রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। গুনাগুন বিচার না করেই তাঁর প্রতিটি কাজের সমালোচনা করেছেন... এইজন্যই তিনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তত দিন তাঁর নামে জয়ধ্বনি বিশেষ শোনা যেত না, কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের দীর্ঘকাল পরেও ইতিহাস তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে।''

(বাঙালী রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৫৭-১৯৯৭)
—অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী

১৮৮২ : ১লা জুলাই ১০টা ২০ মিনিটে জন্ম।

১৮৯৬ : ১৯ই জুন পাটনা শহরে মাতৃদেবী অগোরকামিনীর পরলোকগমন। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯৯ : পাটনা কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯০১ : পাটনা কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়ের সরকারী কার্য হইতে অবসরগ্রহণ।

১৯০৬ : কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যায়

গ্র্যাজুয়েট হলেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ -চিকিৎসক নিযুক্ত হয়ে মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জনরূপে কার্য আরম্ভ। কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসার আরম্ভ।

১৯০৮ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ডি ডিগ্রি লাভ।

১৯১১ : এম আর সি পি (লণ্ডন) এবং এফ আর সি এস (ইংলণ্ড) ডিগ্রি লাভ। প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ৭ই ডিসেম্বর পিতা প্রকাশচন্দ্রের পরলোকগমন।

১৯১৯ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত। ৩৬নং ওয়েলিংটনস্ট্রীটস্থ ভবন ক্রয়।

১৯১৯ : সরকারীর চাকুরি ত্যাগ করে তদানীন্তন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ।

১৯২২ : রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ।

১৯২৩ : ৩০শে নভেম্বর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে উত্তর ২৪ পরগনা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বচকমণ্ডলী কর্তৃক স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে (স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক সমর্থিত) বঙ্গীয় বিধানসভায় সদস্য।

১৯২৫ : স্বরাজ্য দলে যোগদান। রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান্। অধিবেশনে তদানীন্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত। দেশবন্ধু সম্পাদিত ট্রাস্ট ডীডে ট্রাস্টী মনোনীত : চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৮ : জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতার ৪৩ তম অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কংগ্রেসের লাহোর (৪৪ তম) অধিবেশনে যোগদান।

১৯৩০ : কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত। লবণ আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে বেআইনী ঘোষিত নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগস্ট মাসের অধিবেশনে যোগদান, গ্রেপ্তার ও ৬ মাসের জন্য কারাবরণ; সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত।

১৯৩১ : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পারেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা।

১৯৩২ : দ্বিতীয়বার কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা।

১৯৩৩-৩৪ : স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী। গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ এবং আলোচনান্তে সেই প্রচেষ্টায় তাঁহার (গান্ধীজির) সম্মতিদান।

১৯৩৫-৩৬ : বি - ফাইভ - এর মধ্যে ভাঙন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস ইলেকশন কমিটি গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত। মনোনয়ন সম্পর্কে শরৎবাবুর সঙ্গে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের দরুন সভাপতির পদ ত্যাগ।

১৯৩৯ : গান্ধীজির অনুরোধে পুনরায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ; ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ এবং কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন, আইনসভা বর্জনের নীতি গ্রহণে মতভেদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা।

১৯৪১ : বার্মা প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটি গঠন এবং সভাপতির পদ গ্রহণ।

১৯৪২ : গান্ধীজির সম্মতিক্রমে যুদ্ধ উপলক্ষে ভারত সরকারের অনুরোধে সামরিক চিকিৎসক বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।

১৯৪৩ : গান্ধীজির অনশনের সময় (ফেব্রুয়ারী মাসে) উপস্থিতি। মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম অভিভাষণ। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি স্থাপন ও উহার কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৪ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি দান।

১৯৪৬ : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে মালয়ে দুর্গত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য মেডিকেল মিশন প্রেরণ ও পরিচালনাদির ভার গ্রহণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুর্গত কলিকাতাবাসীগণের ত্রাণে সহকর্মীগণ সহ সেবাকার্য।

১৯৪৭ : চক্ষু চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গমন। ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সংযুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিয়োগ। অনুপস্থিতিতে স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুর সাময়িকভাবে নিয়োগ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যপালের পদ ত্যাগ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৮ : জানুয়ারী মাসে গান্ধীজি নয়াদিল্লিতে অনশন আরম্ভ করায় কলিকাতা থেকে দিল্লি গমন। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত পঃ বঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫২ : স্বাধীন ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের বিধানমতে ভারতের প্রথম নির্বাচন কলিকাতা বৌবাজার কেন্দ্রহইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫৭ : মুখ্যমন্ত্রী (২য় বার)

১৯৬২ : (পয়লা জুলাই (১৯৬২) মৃত্যু)। মুখ্যমন্ত্রী (৩য় বার)